মন-কাড়া পদ্য ছড়া

শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত

উৎসর্গ

বাংলার শিশু-কিশোরদের—
যারা বাংলা বই পড়ে আনন্দ পায়

কিছু কথা

ছোটদের জন্য পদ্য ছড়া লিখতে বসে মনে হলো পারব কি? আমাদের ছোটবেলার সঙ্গে এখনকার শিশু-কিশোরদের ছোটবেলার তফাত হয়ে গেছে। আমাদের চারপাশে দাদু, ঠাকুমা, পিসি, মাসি যেসব আপনজন ঘিরে থাকতেন, তাঁদের মুখে গল্প, পদ্য, ছড়া শুনতে শুনতেই বড় হয়েছি। আজকাল ছোটদের মাঝে বইয়ের প্রতি আগ্রহ উসকে দেওয়ার জন্য গল্পবলা দাদু, ঠাকুমা আছেন কি? ছোটরা এখন কম্পিউটার, মোবাইলে গল্প, পদ্য ছড়া পড়ে একা একা। ভার্চুয়াল দুনিয়া ছেড়ে আমার লেখা বই তারা হাতে তুলে নেবে তো? করোনার জেরে গৃহবন্দি ছিলাম অনেক দিন। সেই সময় পদ্য ছড়া লিখতে কলম ধরি। অসমবয়সি বন্ধু রামপ্রসাদ কুণ্ডু সেগুলো ছাপাতে আমায় উৎসাহিত করে। তারই আগ্রহে নানা বিষয়ে প্রতিদিন একটি করে লেখা তার জিম্মায় দিয়ে দিতে পারলেই আমার কাজ শেষ। রামপ্রসাদ তার বন্ধু নীহার চক্রবর্তীর কাছে নিয়ে গিয়ে সেসব লেখা ছবিসহ ফেসবুকে প্রকাশের ব্যবস্থা করে।

নীহারের চিত্রশিল্পী স্ত্রী মৌসুমী আর রামপ্রসাদের স্ত্রী কাজলরেখা হাত লাগায় অলংকরণ ও ফেসবুকে প্রকাশের কাজে। এমনি করে বেশ কিছু পদ্য ছড়া লেখা হলে লন্ডন থেকে বন্ধু অধ্যাপক গবেষক গোলাম মুরশিদ ও তাঁর স্ত্রী এলিজা মুরশিদ বই ছাপার জন্য তাগাদা দেন এবং বাংলাদেশের বন্ধু বিধান চন্দ্র পালকে স্বনামধন্য কোনো প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে বই প্রকাশনার ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করেন। বিধান তাঁর কথামতো বইটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুক্ত থেকে প্রকাশের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বিধানের সহযোগিতা না পেলে বইটির প্রকাশ করা সম্ভবই হতো না। এই বইটি নির্মাণে অধ্যাপক পিনাকেশ সরকারের ভূমিকা নির্দেশক এবং অভিভাবকের। নানা বিষয়ে তিনি পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁর প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা। আমার স্বামী কবি পঙ্কজ সাহার নানা পরামর্শও যুক্ত হয়েছে এর সঙ্গে। সবার যৌথ প্রচেষ্টায় বইটি প্রকাশিত হলো।

কাকে কৃতজ্ঞতা জানাব? সবাই ঘনিষ্ঠ আপনজন, সবাই মিলে কাজ করার আনন্দ উপভোগ করেছি। বইটির ভূমিকা লিখেছেন শিশু একাডেমির সাবেক অধিকর্তা লেখক শাহ্জাহান কিবরিয়া। তিনিও আমার নিকটজন। আর একজনের কথা না বললেই নয়–শিশুসাহিত্যিক গবেষক আনসার-উল-হক। তিনিও নানা বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আর প্রকাশনা সংস্থার কথা না বললে সেটা অপরাধ হয়ে যাবে। বলামাত্র গ্রন্থিক প্রকাশনের স্বত্বাধিকারী রাজ্জাক রুবেল বিধানের প্রস্তাবে নিজে উদ্যোগী হয়ে যত্নসহকারে বইটি প্রকাশের দায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করেছেন। তার সমস্ত কৃতিত্বই বিধানের। বাকি রইল আমার শিশু-কিশোর পাঠকেরা। তাদের ভালো লাগলে আমার প্রচেষ্টা সার্থক মনে করব। আমার অনেক আদর ও ভালোবাসা।

শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত

কলকাতা

১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

ভূমিকা

মানুষ ভাষা আবিষ্কারের পর সাহিত্যের যে শাখাটি প্রথম আয়ত্ত করে তা মনে হয় ‘ছড়া’। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার অনুভূতি ছন্দোবদ্ধ হয়ে ছড়ার মাধ্যমে প্রকাশ ঘটে। ছড়া স্বতঃস্ফূর্ত। শিক্ষিত-অশিক্ষিত যে কেউ তার মনের ভাব জানাতে পারে ছড়ার মাধ্যমে। অনেকের ধারণা, ছড়া শুধু ছোটদের জন্য রচিত হয়। ছড়ার মাধ্যমে শিশুদের যেমন আনন্দ দেওয়া যায়, তেমনি ছড়া ব্যক্তি ও সমাজের সব মানুষের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলো বিদ্রুপাত্মকভাবেও জানান দিতে পারে। অনেক জটিল বিষয়ও সহজ-সরলভাবে প্রকাশ করা যায়। ছড়া ইতিহাসের কথাও বলে।

বাংলা ভাষায় রচিত ছড়া অনেক সমৃদ্ধ। প্রবাদ বাক্যের মাধ্যমে ছড়া আদিকাল থেকে চলে আসছে। ছড়ার মাধ্যমে আমরা তৎকালীন সমাজব্যবস্থার চিত্রও অনুধাবন করতে পারি। বর্গিদের অত্যাচারে দেশবাসী যখন জর্জরিত, তখন মায়েরা ছড়া কাটত: “ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গি এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে?” কিংবা অন্নদাশঙ্কর রায় দেশবিভাগ নিয়ে যখন লেখেন: “তেলের শিশি ভাঙলো বলে খুকুর ’পরে রাগ করো, তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো।” সুকুমার রায় যখন লেখেন: “সবে হলো খাওয়া শুরু, শোন শোন আরো খায়,

সুদ খায় মহাজনে, ঘুষ খায় দারোগায়।”–এর মধ্য দিয়ে দুই ভিন্ন পেশার মানুষের ঘৃণ্য মানসিকতার চিত্র ফুটে উঠেছে। ছোটদের জন্য ধূমপান যে নিষিদ্ধ তার প্রকাশ ঘটেছে: “জ্যাঠা ছেলে বিড়ি খায়, কান ধরে টানিও।”

বাংলাদেশের ছড়াকার ফয়েজ আহমদ ব্যঙ্গাত্মক ছড়া লিখেছেন: “জুতো হলো আয়না, কিছু এসে-যায় না।” ছড়া ছোট-বড় সবাইকে যেমন আনন্দ দান করে, তেমনি তাদের নতুন পথনির্দে-শও করে। মন্দ বিষয়ে সতর্কও করে দেয়।

শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত দীর্ঘদিন ধরে ছড়া লিখছেন। তাঁর ছড়া সব শ্রেণির পাঠকের কাছে উপভোগ্য। ধর্মীয় সম্প্রীতি নিয়ে তিনি লিখেছেন: “নদীর বুকে দুর্গা ভাসে, হাওয়ায় ভাসে আজান। মা-বোনেরা রেকাবিতে মিষ্টি সেমাই সাজান।”

বিশ্ব শান্তির প্রবক্তা হয়ে শর্মিষ্ঠা লিখেছেন:
“এসব কথা বলবো কাকে
দূরে হটাও যুদ্ধটাকে,
যুদ্ধবাজের দল,
বানায় কেবল গোলা-কামান
যুদ্ধজাহাজ যুদ্ধবিমান
মানুষ মারার কল।”
অথবা ‘পৃথিবী বাঁচাও” ছড়ায় লিখেছেন:
“জেনে রাখো ভোলা
পৃথিবীটা হয়ে আছে আগুনের গোলা।
হাতে হাত দাও
একসাথে হয়ে লড়ো
পৃথিবী বাঁচাও।”
অলসতার নিন্দা করে লিখেছেন:
“অলস বুড়ো ভাবছে বসে,

এমন যদি হতো
অন্যলোকে ভাত খেলে তার
পেটটা ভরে যেত।”

এ ছাড়া আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বাংলাদেশের জনপ্রিয় লোকগল্প: “কত রবি জ্বলে রে, কেবা আঁখি মেলে রে।”

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কথা বলা হয়েছে “দাঁড়াতে হয় ঘুরে” ছড়ায়:

“পালিয়ে কোথাও যায় না বাঁচা
দাঁড়াতে হয় ঘুরে।”

ছড়াকার শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত নানা ধরনের উপদেশসহ পশু-পাখি, গাছপালা ও বিভিন্ন বিষয়ে ছড়া লিখেছেন, যা তাঁর অভিজ্ঞতায় এসেছে। প্রতিটি ছড়া অত্যন্ত প্রাঞ্জল, সহজ-সরল ভাষায় রচিত। জটিল বিষয়গুলোও তিনি চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন। ‘কাবুলিওয়ালা’সহ অনেক বিখ্যাত গল্পের মূল কাহিনি তিনি ছড়ায় ব্যক্ত করেছেন।

এ গ্রন্থের একশটি ছড়ার সব কটি নিয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে পড়তে শুরু করলে থামা যায় না। এখানেই ছড়াকারের কৃতিত্ব। আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

শাহ্‌জাহান কিবরিয়া
শিশুসাহিত্যিক
সাবেক পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

সূচিপত্র

রাগী বুড়ি ॥ ০১
আলসে বুড়ো ॥ ০২
গোমড়ামুখো নাতি ॥ ০৩
ভোম্বল রায় ॥ ০৪
সৃষ্টিধরের মেয়ের বিয়ে ॥ ০৫
বাবার ছোটবেলা ॥ ০৬
বোষ্টমি আর মুশকিল আসান ॥ ০৭
শিলকোটানেওয়ালা ॥ ০৮
বেড়া ॥ ০৯
প্রতিবেশী ॥ ১০
মেয়েটা ॥ ১১
গৌরবরণ পাত্র ॥ ১২
সময় ॥ ১৩
বদলে যাচ্ছে সময় ॥ ১৪
দাঁড়াতে হয় ঘুরে ॥ ১৫
হঠাৎ হতো যদি ॥ ১৬
আজকের রূপকথা ॥ ১৭
বড়মা ॥ ১৮
ডাকছে আকাশ ॥ ১৯
ভাবুক ছিল বেশ ॥ ২০
চিড়িয়াখানা ॥ ২১
একসাথে ॥ ২২
ঘুমপরিদের দেশে ॥ ২৩
বন্ধু ॥ ২৪
ছোট্ট চড়াই ভাজা কড়াই ॥ ২৫
মনের ভাষা ॥ ২৬
কাকেশ্বর কুচকুচে ॥ ২৭
কালো ॥ ২৮
২৯ ॥ সবুজ টিয়া
৩০ ॥ ল্যাজঝোলা পাখি
৩১ ॥ কাকাতুয়া পার্লারে
৩২ ॥ এসপেরান্তো
৩৩ ॥ কাঠবিড়ালি
৩৪ ॥ খরগোশ-কচ্ছপের গল্প
৩৫ ॥ রং বদলায়
৩৬ ॥ জন্মদিন
৩৭ ॥ হাবা-গবার কুকুরছানা
৩৮ ॥ এক ছিল জঙ্গল
৩৯ ॥ দখল
৪১ ॥ অহংকারী মানুষ
৪২ ॥ কোনটা বেশি কোনটা কম
৪৩ ॥ হালাল না ঝটকা
৪৪ ॥ ভোজন
৪৫ ॥ খাওয়া
৪৬ ॥ পিঠে সংক্রান্তি
৪৭ ॥ নানা খানা
৪৮ ॥ ঠান্ডি পোলাও
৫০ ॥ পেটপুজো
৫১ ॥ ইদের ফিতরা
৫২ ॥ ইচ্ছেমতো
৫৪ ॥ পেটুক দামুর ঠাকুরদাদা
৫৫ ॥ ছুটি
৫৬ ॥ শেখা
৫৭ ॥ ছোটবড় – ভালোমন্দ
৫৮ ॥ পা আর মাথা
৫৯ ॥ অন্ধকারে কানাগলি

দুঃস্বপ্ন ॥ ৬০
মরণফাঁদ ॥ ৬১
ফিরে আয় ॥ ৬২
থ্যাঙ্কু করোনা ॥ ৬৩
যাচ্ছি ॥ ৬৪
পুজোর ম্যারাপ ॥ ৬৫
বিজয়া ॥ ৬৬
কেমন ছুটি ॥ ৬৭
ঘুমের ছুটি ॥ ৬৮
খুকুমণির নাগরা ॥ ৬৯
জাকাত ॥ ৭০
মনে মনে ॥ ৭১
পুজোয় ভ্রমণ ॥ ৭২
হুইলচেয়ারে ভ্রমণ ॥ ৭৩
বিমানযাত্রা ॥ ৭৪
অনধিকার প্রবেশ ॥ ৭৫
হুতুমের করোনা ॥ ৭৬
করোনা প্রিন্ট ॥ ৭৭
কোথায় গেল ॥ ৭৮
রথের মেলায় সওদা ॥ ৭৯
॥ ৮০ বদলে যাচ্ছে
॥ ৮১ গঙ্গাচুরি
॥ ৮২ পৃথিবী বাঁচাও
॥ ৮৩ খোকনের পড়াশুনো
॥ ৮৪ অন্য পাঠশালা
॥ ৮৫ ছবির প্রদর্শনী
॥ ৮৬ ইদের জাকাত
৮৭ ॥ কথাগুলো খটোমটো
৮৮ ॥ খোকার আবদার
৮৯ ॥ এক একটা দিন
৯০ ॥ স্বপ্ন নিরুদ্দেশ
৯১ ॥ ঘুমটুম স্বপ্নটপ্ন
৯২ ॥ ইছামতী
৯৩ ॥ এপার বাংলা ওপার বাংলা
৯৪ ॥ ঝগড়া না কাজিয়া
৯৫ ॥ কাবলিওয়ালার দেশে
৯৭ ॥ তফাৎ যাও
৯৮ ॥ যুদ্ধ হটাও
৯৯ ॥ বদলে গেল শহরটা
১০০ ॥ কালের ইতিহাস

রাগী বুড়ি

এক যে ছিল ভীষণ রাগী বুড়ি
রাগ ঝগড়া কোঁদল ভরা
তার ছিল তিন ঝুড়ি

এক ঝুড়ি রাগ রাখতো গিয়ে
প্রতিবেশীর দরজায়
পড়শি ভয়ে দোর খোলে না
মরচে ধরে কবজায়

ঝগড়া ভরা ঝুড়ি দেখে
ডাকতো কুকুর ঘেউ
ভুল করে লোক ওই রাস্তা
মাড়ায় না আর কেউ

কোঁদল ভরা এক ঝুড়ি রাগ
রাখতো বুড়ি ঘরে
বন্ধু-স্বজন এলে তখন
ঢালতো তাদের ’পরে

বুড়ির ঘরের তিন সীমানায়
যায় না শেয়াল-কুকুর
রাগী বুড়ি একা একাই
কাটায় সারা দুপুর।

আলসে বুড়ো

সে ছিল এক আলসে বুড়ো
নড়েচড়ে বসতো না
লোক দেখলেই ফাইফরমাশ
কেউ কাছে তার ঘেঁষতো না

সকালবেলায় আলসে বুড়োর
ইচ্ছে তো নেই নড়তে
তার হয়ে কেউ চান করলে
হবে না চান করতে

অলস বুড়ো ভাবছে বসে
এমন যদি হ'তো
অন্যলোকে ভাত খেলে তার
পেটটা ভরে যেত

সারাটা দিন আলসে বুড়ো
থাকে শুয়ে-বসে
চান-খাওয়া সব ছেড়ে দিয়ে
অক্কা পেলো শেষে।

গোমড়ামুখো নাতি

বুড়োবুড়ির ছিল যে এক
গোমড়ামুখো নাতি
সারাটা দিন খাচ্ছে-দাচ্ছে
যেন মস্ত হাতি

খাচ্ছে কিন্তু চিবুচ্ছে না
কোৎ করে খায় গিলে
গিলতে মস্ত হাঁ করে যেই
খাবার নিলো চিলে

চিলের খোঁজে গোমড়া নাতি
ছুটল দেশে দেশে
পায় না দেখা চিল উড়ছে
কোন-সে নিরুদ্দেশে

সেই থেকে আর গোমড়ামুখো
মুখটি খোলে না
যত তুমি চেষ্টা করো
দেখবে না তার হাঁ।

ভোম্বল রায়

অম্বলে ভুগছিল ভোম্বল রায়
কম্বল গায়ে দিয়ে চম্বলে যায়
সম্বল ছিল তার দম্বল সাজা
রাখবে কোথায় বাটি হয়নি তো মাজা।